শান্তিনিকেতন

(নবম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা ।

প্রকাশক

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

আশ্রম	...	...	১
তপোবন	...	...	২৭
ছুটির পর	...	...	৯৫
বর্ত্তমান যুগ	...	...	১০৩

শান্তিনিকেতন

আশ্রম

(শান্তি নিকেতনের বাৎসরিক
উৎসব উপলক্ষ্যে)

প্রভাতের সূর্য্য যে উৎসব দিনটির পদ্মদলগুলিকে দিকে দিকে উদ্ঘাটিত করে দিলেন তারই মর্ম্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে আজ আমাদের আহ্বান আছে। তার স্বর্ণরেণুর অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে সেখান থেকে কি কোনো সুগন্ধ আজ আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছয় নি? এই বিশ্ব উপবনের রহস্য-নিলয়ের ভিতরটিতে প্রবেশের সহজ অধিকার আছে যার, সেই

চিত্তমধুকর কি আজও এখনো জাগ্‌ল না? কোনো বাতাসে এখনো সে কি খবর পায় নি? আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুখের অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে দূর ভবিষ্যতের পথিক। আজ তাকে ধরে, দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, তার যা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজ্ঞাসা করলে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আমরা মনে করি, এই গান, এই বাদ্যধ্বনি, এই জনতার কোলাহল, এই বুঝি তার যা ছিল সমস্ত, আর বুঝি তার কোনো বাণী নেই! কিন্তু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া হবে না—আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে যে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিজ্ঞাসা কর, আজ এ কিসের উৎসব?

প্রতি বৎসর বসন্তে আমের বনে ফলভরা

শাখার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বইতে থাকে—সেই সময়ে আমের বনে তার বার্ষিক উৎসবের ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কি নিয়ে, কিসের জন্যে? না, যে বীজ থেকে আমের গাছ জন্মেছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে এই শুভ খবরটি দেবার জন্যে। বৎসরে বৎসরে ফল ধরচে—সে ফলের মধ্যে সেই একই বীজ—সেই পুরাতন বীজ। সে আর কিছুতেই ফুরচ্চে না—সে নিত্যকালের পথে নিজেকে দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত সহস্রগুণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্ম্মস্থান যদি উদ্ঘাটন করে দেখি তবে দেখ্‌তে পাব এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্চে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-

বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্যে ফল্‌চে; এবং আমাদের আগামীকালের উত্তরবংশীয়দের জন্যে ফল্‌তেই চল্‌বে।

বহুকাল পূর্ব্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর ক'জন লোকই বা জান্‌ত? যারা জেনেছিল যারা দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘট্‌ল এবং আজ্‌কেই এটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেল্‌তে পারেনি। সেই একটি দিনের মধ্যেই এ'কে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। সেদিন যার খবর কেউ পায়নি এবং তারপরে বহুকাল পর্য্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে বৎসরে বৎসরে উৎসব ফল প্রসব করচে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্চে কিন্তু চিরপ্রাণ ত তাদের স্পর্শ করে না—তারা ঘট্‌চে এবং মিলিয়ে যাচ্চে তার হিসেব কোথাও থাকচে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহূর্ত্তটিকে কখন্ লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান—তারপরে তাকে কেউ না দেখুক না জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্, তাকে আবর্জ্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক—সেদিনকার এবং তারপরে বহুদিন-কার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাকুক্—কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে—নিত্যকালের সূর্য্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে—সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ঙ্কর

ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন—তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কি রকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয়নি। আজও সে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠ্‌চে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই যে প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও! তাঁর সেই

প্রকাশ যাঁর জীবনে আবির্ভূত তিনি ত আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখ্তে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্ব্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন

যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে, এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখ্তে পান তখন তিনি আর গোপনে থাকৃতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন তাঁর আর পর্দ্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই—তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের

মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখেনি তারা অহংকেই বড় করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই যে অহঙ্কার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহংয়ের দিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহংয়ের আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই ত নিজের প্রচুর তেল ও পলতের

সঞ্চয় নিয়ে গর্ব্ব করে—আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল পল্‌তের দিকে ফিরে তাকায়? সে ঐ আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত পল্‌তে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাক্‌তে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ম্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং দীপ যখন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে কি আর অহঙ্কারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো

ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেই জন্যেই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই দেখতে পায়। সে ত কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এই জন্যই তার বাক্য ও কর্ম্ম নিত্য হয়ে ওঠে— তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে, যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে' আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল—তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল—এই জন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনী গৃহের প্রস্তরকঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালের দিকে উদ্‌ঘাটিত করে

দিয়েছে—এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তি-নিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন এ'কে সৃষ্টি করে তুলচে।

তিনি আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি জানতেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জ্জন উপাসনার জন্যে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু ন ততো বিজুগুপ্সতে। যে জায়গায় বড় এসে দাঁড়ান সে জায়গাকে ছোট বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে—তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না—এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে,—এ আপনিই আজ

আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূত-ভব্যস্থ, তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং" আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোন অতীতকালের জিনিষ

হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগ-সাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয় তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না—মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব—এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড় করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব—পরস্পরকে খর্ব্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলা-ঠেলি করতে থাকব—সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতংরূপে বিরাজ করচেন তাঁকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ, না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে জন্যে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর সুরটিকে বিশুদ্ধভাবে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয় সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্চে অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে; এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে; ঈশানো ভূতভব্যস্য এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড় আসন পেতে-

ছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করচে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্ম্মল করে দিচ্চে—সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সঙ্কোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্চে—তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্চে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্চে, তাদের ধৈর্য্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীরতর হয়ে উঠচে—এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্যে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা দুঃখকে অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্য দিনে দিনে প্রস্তুত

হচ্চে—এবং যে জ্যোতির্ম্ময় পরমানন্দ ধারা বিশ্বের দুই কূলকে উদ্বেল করে দিয়ে নিরন্তর-ধারায় দিক্‌দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্চে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্যে তারা একটি আহ্বান শুন্‌তে পাচ্চে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্যময় সৃষ্টির কাজ চল্‌চে সেই রহস্যটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্চে! যে একটি জীবন দেহের আবরণ আজ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে সেই জীবনের ভাষামুক্ত স্বরমুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে নির্ম্মল ভক্তিরসে সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলি বিকীর্ণ করচে—কেবলি বলচে তিনি আমার প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি, মনের আনন্দ, সে বলা আর শেষ হচ্চে না—সেই আনন্দের কাজ আর ফুরালো না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে,

সৃষ্টির শক্তি ত আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ সম্মিলন ত শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। সেই আনন্দই আজও সৃষ্টি করচে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলেছে—এখানকার গাছপালার শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্চে। অনেকদিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত্ত এখানকার সূর্য্যোদয়কে, সূর্য্যাস্তকে এবং নিশীথ রাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মত অনির্ব্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলচে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে যেতে

এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন—সেই দিনটি আর মরলনা—সেই দিনটি বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি-শক্তির মধ্যে চিরদিনের মত আট্‌কা পড়ে গেল, শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুল্‌তে লাগল—যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে ছিল বিভীষিকা সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্ত্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল, এই যে আশ্চর্য্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্ম্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মান্‌তে চায় না তখন সেই

অপর্য্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃত বর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকী-কুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্য্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্ব্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য, একটী পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফল পুষ্প পল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করচে না?

নিশ্চয়ই করচে। কেননা এই খানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড় রহস্য নিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে—এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে—যেই এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ যে ইনি ইহার পরমানন্দ সেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে—হঠাৎ কত উষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায়, কত নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সমুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুনতে পাব না? কাউকেই কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সাম্‌নে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দ গান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুল্‌বে না? না, তা কখনই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও

ফিরবে, পাষাণ হৃদয়ও গলবে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে—সে শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে শক্তি চারিদিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না—তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানিনে; তোমার সূর্য্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ করচে যদি গণনা

করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই কিন্তু তাকে আমরা আলো বলেই জানি শক্তি বলে জানিনে। তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করচে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি, যা আলো হয়ে আমাদের সাম্‌নে নানা রঙের ছবি আঁকচে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান করচে, যা বল্‌চে "আমি জল," বলে, আমাদের স্নান করাচ্চে, যা বল্‌চে আমি স্থল বলে আমাদের কোলে করে রেখেছে—যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জান্‌তে পারি—তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি ; তখন তোমার যে শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন তত্তো বিজু-

গুপ্সতে—তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে, বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য প্রয়োজন সকল সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে উচ্ছসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্চে, দিনে দিনে ধীরে ধীরে, গভীরে গোপনে—কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা যে মুহূর্ত্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়ে উঠ্‌তে থাকে। তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখ্‌তুম, কানে শুনতুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে

ওঠে—সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে ত কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি ত অচেতনভাবে হবে না, সেটি ত মুখ ফিরিয়ে থাকলে পাব না। হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্ম্মের যোগ। আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার শক্তিকে পাব ভিক্ষার দ্বারা নয় এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা করে সেই সব চেয়ে বঞ্চিত হয়। যে সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে' আত্মানং পরিপশ্যতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে; সে এমনি

পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্ম্মল করব, আমরা আজ যথার্থ ভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব, যে সাধক এখানে তপস্যা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্ম্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের মধ্যে

তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে থাকবে।

৭ই পৌষ, প্রাতঃকাল, ১৩১৬

তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট কাঠে তৈরি—সেটি সহর। উন্নতির সূর্য্য যতই মধ্যগগনে উঠচে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়চে। চূন সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারচে না।

এই সহরেই মানুষ বিদ্যা শিখচে, বিদ্যা প্রয়োগ করচে, ধন জমাচ্চে, ধন খরচ করচে, নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলচে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুতঃ এছাড়া অন্য রকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত

হয়ে ওঠে—এবং চারদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় সার পদার্থ সকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মানুষের অনেক প্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্য্যে সর্ব্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্চে সহর।

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক জায়গায় সহর সৃষ্টি করে বসে তখন সেটা সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মানুষ একত্র হয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যে কারণেই হোক্, অনেকে একত্র হবার

একটা উপলক্ষ্য ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ সহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল,—ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয়, তারা বাঘের মত হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মত নির্ব্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জ্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করেনি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটেনি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগেনি এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানতঃ বহিরভিমুখী হয়নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের

গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে—নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্য্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয়নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জ্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ্ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অন্নস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্বিজয়ী হয়েছে—এমনি করে এক একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্য্যাবর্ত্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ দ্বীপান্তর থেকে সে যে সমস্ত সম্পদ্ আহরণ করে এনেছিল, সমস্ত

মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে, ধ্বনিতে ও রূপ-বৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তারি মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন; সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বল্‌তে পেরেছিলেন—"যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং" এই যা কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্চে। তাঁরা স্বরচিত ইঁটকাঠলোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না—তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে,

কুশসমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জান্‌তে পেরেছিলেন। চতুর্দ্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জ্জীব বলে, পৃথক বলে জান্‌তেন না। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্নজল প্রভৃতি যে সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জান্‌তে পেরে-ছিলেন—সেইজন্যেই নিশ্বাস, আলো, অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে

আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে নিগূঢ়-প্রাণের মধ্যে কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড় বড় প্রাচীনযুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সে দুইযুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে! কেবল বৈদিক ঋষিরা নন্, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন—রাজ-প্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায়নি—বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য, সাম্রাজ্য, নগর-নগরী স্থাপিত হয়েছে—দেশ বিদেশের সঙ্গে তার পণ্য আদানপ্রদান চলেছে—অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে—কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্য্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ

বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জাবোধ করেনি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে—এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদি পুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণ কথায় যা কিছু মহৎ আশ্চর্য্য পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড় বড় রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করেনি কিন্তু নানাবিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্য্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব ইতিহাসে এইটেই হচ্চে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি—তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে।

তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি—তখন, চীন, হূন, শক, পারসিক, গ্রীক্, রোমক্, সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে—তখন জনকের মত রাজা একদিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করচেন, অন্য দিকে দেশ দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্চেন এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবন চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্ত্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনি উদ্ঘাটিত

হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশসমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসচেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্‌গমন করচে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মত; তারা নীবার ধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসঙ্কোচে কুটীরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনি-কন্যারা গাছে জল দিচ্চেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠ্‌চে অমনি তাঁরা সরে যাচ্চেন,—পাখীরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবার ধান্য কুটীরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত, এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করচে। আহুতির সুগন্ধধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্ব্বশরীর পবিত্র করে দিচ্চে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা এই হচ্চে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে, ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করচে তারও মূল সুরটি হচ্চে ঐ,—চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখচেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করচে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করচে, কুটীরের অঙ্গণে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে; সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে—বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করচে, অরণ্য-কুক্কুটেরা বৈশ্বদেব-বলিপিণ্ড আহার করচে;

নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্চে,—হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করচে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্চে ঐ।—তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্চে, এই পুরান কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যে সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে-তাই না কি প্রধানত নাটকের উপাদান এই জন্যেই অন্যদেশের সাহিত্যে দেখ্‌তে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্য্যন্ত খ্যাতি

রক্ষা করে আস্‌চে তাতে দেখ্‌তে পাই প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎপ্রকৃতি আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলি একান্ত মানব-ময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধি-গ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জ্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করচে অথচ দেখাচ্চে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে— যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্তই একটা বাহার মাত্র— এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের

সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখ্‌চে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্ব্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচাবয়সের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণ তরুণীর যে মিলন সঙ্গীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নীচের সপ্তক থেকেই সুরু হয়েছে, শকুন্তলা কুমারসম্ভবের মত তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছয়নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝঙ্কৃত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্রমুখরিত নিদাঘ-দিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত; আপক্বশালি-রুচিরা শারদলক্ষ্মী

তাঁর হংসরব-নূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে মন্দ্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্ম্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখ্‌লে তার অত্যুগ্রতা থাকে না— সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কীর্ণ করে দেখ্‌লে তাকে ব্যাধির মত অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখ্‌তে হয়। শেক্সপিয়রের দুই একটি খণ্ডকাব্য আছে নর-নারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়;—কিন্তু সেই সকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত,—তার চারদিকে আর কিছুরই স্থান নেই; আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীতগন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই—এইজন্যে সেসকল কাব্যে প্রবৃ-

ত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্চে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্ব্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পাননি। আতসকাচের ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্রে সূর্য্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে—কিন্তু সেই সূর্য্যকিরণ যখন আকাশের সর্ব্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্ত-প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্ব্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যা-নির্ঘোষকে বিশ্ব-সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজাননি; যে পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর

ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্রবর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয় সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপ দৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মত বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা। প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

প্রাচীনকালে হিন্দু সমাজে জীবনযাত্রায় যে একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারম্বার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখ্‌লে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সঙ্গীত শিল্পকলার আলোচনায় ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণ-বহুল সম্ভোগের সুর যে বাজেনি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্য্যে খচিত হয়ে ছিল। এই রকম একদিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখ্‌তে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্য-

বিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় ত তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্য্য কারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলি মুক্তিকামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশ্বর্য্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্ম্মল সুদূরকালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্য্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়।

বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন—সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয় সেবা ছিল, বার্দ্ধক্যে যাঁরা মুনি-বৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের

দেহত্যাগ হত—আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্ত্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্ত্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে, তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বুঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কি? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজ-প্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীর তেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করে-ছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার

ধন। আবার যে ভরত বীর্য্যবলে চক্রবর্ত্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্ম-ঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তা'কে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্য্য গৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদ-ভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে—কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্ব্বনাশ করে সেও ত কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে

দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতি-প্রকটবর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসম্বৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গল-জটাধারী ঋষিবালকের মত পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তা-পাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদয় বার্তায় জগৎকে উদ্বোধিত করে তোলে—কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধতেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মি-চ্ছটায় পশ্চিম আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই

বাক্যহীন কর্ম্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশ জ্যোতিষ্কের নির্ব্বাপন বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বল্‌চেন, ছিল কি, আর হয়েছে কি! সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য্য আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্চে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণ-রাশির সীমা নেই, আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্চে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো

হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্য্যের উদ্ভব, সেই শৌর্য্যেই মানুষ সকল প্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধি-মগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়—আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্য্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠ্‌লেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সঙ্কীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহঙ্কারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড় করে তুল্‌তে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে পাপ।

এই জন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। এই

ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহঙ্কারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে—আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্ব্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্চে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ—কিন্তু শিব হচ্চেন সকল দেশের সকল কালের—কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘট্‌তেই পারে না।

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের

মর্ম্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা—লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার—এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্য্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিষ, মানুষের জীবন গঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড় রাসায়নিক শক্তি; এরদ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করচেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া

উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলচেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। "যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে, ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন—এইটেই হচ্চে তপোবনের সাধনা। এই জন্যেই তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয় সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে অন্যদেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এই জন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব

করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্ব্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তাহলে বল্‌তে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্ব-জনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেচেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার

সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনি শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য্য অগ্নি বায়ু জল স্থল আকাশ তরুলতা মৃগ পক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দ্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই যে একটি শান্তরসের সঙ্গীত বাঁধা হয়েছিল এই সঙ্গীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড় স্থান দেওয়া হয়েছে; এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপো-বন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে

একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠ্‌চেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করচেন, কুশ-সূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদী তৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করচেন; এই তপোবনটি দুষ্যন্তশকুন্তলার প্রেমকে সারল্য, সৌন্দর্য্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর সন্ধ্যামেঘের মত কিম্পুরুষ পর্ব্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করচেন,—লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মত সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে

ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে,—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদ-দুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

একথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্ত্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃত-লোকের। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্চে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্চে যেমন-হওয়া ভালো। এই "যেমন-হওয়া-ভালো"র দিকে "যেমন-হয়ে-থাকে" চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করচে, পূর্ণ করচে। "যেমন-হয়ে-থাকে" হচ্চেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর "যেমন-হওয়া-ভালো" হচ্চেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও "যেমন-হয়ে-থাকে" তপস্যার দ্বারা

অবশেষে "যেমন-হওয়া-ভালো"র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানস লোকের এই যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌছয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড় হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী, সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ—অতএব কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্ব্বতের পর পর্ব্বত পার হয়ে গেছেন, তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন কিন্তু তাঁরা ক্লেশ বোধ করেননি। এই সমস্ত নদীগিরিঅরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল—এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি—তিনি বনের আনন্দকেই বারম্বার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্ত্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য্য যাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কথনই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না।

সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকৃতে পারে না। সেই সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখ্তে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্যে পালিত কিন্তু ঐশ্বর্য্যের আসক্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করেনি। ধর্ম্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে প্রবাসদুঃখ ভোগ করেননি; এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলি আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভুত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন—

একৈকং পাদপংগুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্
সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্।
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

যে সকল তরুগুল্ম কিম্বা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্ব্বে কথনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দ বোধ করলেন।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন—তিনি

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মাল্য-বতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ—

গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিখর দেখিয়ে বলছেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদ্‌গণের কাছথেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সূর্য্যমণ্ডলের মত দুর্দ্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম শরণ্যং সর্ব্বভূতানাম্। ইহা ব্রাহ্মীলক্ষ্মী

দ্বারা সমাবৃত। কুটীরগুলি সুমার্জ্জিত, চারিদিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল—কোথাও বা রমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকের মৃগ পক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন। এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়—সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল—সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহন-

তার রহস্যকে একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের As you like it নাটক একটি বনবাসকাহিনী—টেম্পেষ্ট্‌ও তাই, Midsummer night's dreamও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সেসকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত—অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখ্‌তে পাইনে; অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটেনি—হয় তাকে জয় করবার, নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্ব্বদাই রয়েছে,—হয় বিরোধ, নয় বিরাগ, নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিল্‌টনের প্যারাডাইস্‌ লষ্ট্‌ কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও

মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করচে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাইনে যে এই আদি দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করচেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে নানালীলায় সম্মিলিত করে তুলচেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে "Beast, bird, insect or worm durst enter none ; such was their awe of man." অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জান্‌বে —এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্ত্তন করবার জন্যেই; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করচেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে। মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্ব্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্চে এই যে মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে! সে মিলন মূঢ়তার মিলন নয় সে মিলন

চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্ত্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম, সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্য্যবেগে চারিদিকের জলস্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন "যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে" তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্ব্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে সকল গাছ পাখী ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণগলার মত গলে যাচ্চে।

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করচে না। বিরহ-দুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায় প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নগনদী-অরণ্যনগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়-

বেদনাকে কবি সঙ্কীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এই জন্মই প্রভুশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্ত্তা চির-কালের মত বর্ষাঋতুর মর্ম্মস্থান অধিকার করে' প্রণয়ী-হৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসঙ্গীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্চে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়-বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখ্‌তে পাই।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে—এক, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর এক, মিল-নের মধ্যে। এক, ভোগের দ্বারা, আর এক, যোগের দ্বারা; ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এই জন্যেই দেখতে পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য্য বা মহিমার আবির্ভাব সেই খানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান। মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে

পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই—এখানে চাষও চলে না, বাসও চলে না—এখানে পণ্য-সামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়,—অন্তত সেই সমস্তই এখানে মুখ্য নয়—এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি করে' আত্মাকে সর্ব্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে এই জন্যেই তা পুণ্য স্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নদীগুলি লোকালয় সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্য দান করে আস্‌চে তারা সকলেই পুণ্যসলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ

বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, পুষ্কর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্ব্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলচে, যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্য-নিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব্ব করেনি— তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্ম্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয়নি; এই বিশ্ব-

প্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করচে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না। প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন কি, উপাধিও পায় অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায় কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যারা দেখবার জিনিষকে দেখ্‌বে না, পাবার জিনিষকে নেবেনা, শেষ পর্য্যন্তই তাদের বিদ্যা পুঁথিগত ও ধর্ম্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ আছে বলেই কল্পনা করে, এতে মানুষের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে

নির্ব্বাসিত করে নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জ্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারিনে।

কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটি সংখ্যক পূর্ব্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড় জিনিষ বলে শ্রদ্ধা করিনে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে

সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে লোক কাটিয়ে উঠেছে—এই জন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্য সংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম চৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জ্জনা করে দিচ্চে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এই জন্যে প্রত্যহই নানা কর্ম্মে নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে —যে লোক চেতন ভাবে তাই স্মরণ করতে

পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধ শক্তি স্বীকার করতে পারে সে লোক খুব একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না; কারণ, এই সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা—তার মধ্যেও চিত্তের উদ্বোধন এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলি ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে একথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্য মাংস আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া

যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখিনে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের জন্যে নয়, নিজের শরীরের পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্যে নয়—তার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিষ বলে দেখি তবে কখনই তাকে সত্যরূপে দেখ্‌তে পারিনে—তবে প্রাণ জিনিষটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুদ্ধমাত্র প্রাণীহত্যা করাই আমোদের অঙ্গ হয়ে ওঠে—এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহ্বরে দেশে বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভ্রষ্টতা, এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্ব্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে তার একটি প্রধান লক্ষণ কি? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্ব্বত্রই নিয়মকে দেখ্‌তে পাচ্চে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা না দেখ্‌তে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল— সে দেখ্‌ছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে আর এই বিরাট্‌ বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এই জন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান, অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে—এই হচ্চে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্চে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়—বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ,

মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃপরতস্তু সঃ।

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্চেন তিনি।

ইন্দ্রিয় সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ সাধন হয়—কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর—কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময়

যোগ, তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ!

এই সকলের-চেয়ে-শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখ্‌তে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়—আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল কলেজেও তপস্যা আছে

কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা। বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যে সকল পূর্ব্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে বড় এবং দূরে আছে বলে ছোট, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখ্‌লে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখ্‌লেই সার্থক তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্চে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠ্‌লে চিত্তের সাম্য থাকে না সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিষকে আমরা শ্রেয় দেখি, সে জিনিষটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই; লোভের জিনিষকে আমরা বড় দেখি

সে জিনিষটা সত্যই বড় বলে নয় আমাদের লোভ আছে বলেই।

এইজন্যে ব্রহ্মচর্য্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক—ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চল্‌চে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্ম্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেই খানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠ্‌বেন এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞানবিহীনের দুরাশা মাত্র। কিন্তু সে আমি কোনোমতেই

স্বীকার করতে পারিনে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়—সেই জন্যেই তার সাধন চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্চে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিষটার দরকার আছে এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করিনে যে টাকা উপার্জ্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি—তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব প্রথমত দেশেব সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠ্‌বে।

বর্ত্তমানকালে এখনি দেশে এই রকম

তপস্যার স্থান, এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতর আশা করিনে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের উর্দ্ধে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বল্‌তে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারিনে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা

করিনে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্ব্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানাদিক্‌কে অধিকার করে নিয়েছিল সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক ব্যায়াম চর্চ্চা নয়। যোগ-সাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি, ঐশ্বর্য্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয় আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।

বহু প্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসঙ্কুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্য্য পিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপীয়-দল ঠিক তেমনি করেই নূতন আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ড সকলকে অনুবর্ত্তীদের জন্যে অনুকূল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্ব্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনো যেমন হয়েছিল এখনো তেমনি হয়েছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছয়নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড় বড় সহর

ইন্দ্রজালের মত জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে সহরের সৃষ্টি হয়নি তা নয় কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয়নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল, যা বর্ব্বরের আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়; ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্যস্থান হয়ে ওঠেনি; মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয়নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড় জিনিষ কিছুই দেয়নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড় পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে আপনার সঙ্গে যুক্ত করেনি

তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে তার সঙ্গে মিলিত করে নেয়নি। নগর নগরাই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এই নগর স্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে; আর তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তাল গাছের মত একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মত অসংখ্য ডালে পালায় আপনাকে চারদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়।

তার যে শাখাটি যেদিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্ম্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের মত ছাঁচে ঢালবার জিনিষ নয়। বাজারে কোনো বিশেষকালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্ত্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুসি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

ছোট পা সৌন্দর্য্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সঙ্কুচিত করে চীনের মেয়ে ছোট পা পায়নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত

করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

একথা দৃঢ়রূপে মনে রাখ্‌তে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিষের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিষটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চল্‌তে পারে না, তাহলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাক্‌বে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মান বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাক্‌বে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে, যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ

আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কি। সে সত্য প্রধানত বণিগ্বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্ব্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্চে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্ম্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দুমুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা

করচে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিক-ভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানাদিক্ থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বজীবে দয়া, সর্ব্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদরূপে ছিলনা; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে এ'কে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল; সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি—তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে

স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড় মনে হয় কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে—এই যোগ অহঙ্কারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্ব্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি—এই জন্যেই ঝড় চিরদিন টিঁকতে পারে না, এই জন্যেই ঝড় কেবল সঙ্কীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে—আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না,

আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এই জন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথ্বিবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

ছুটির পর।

(শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে)

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হয়েছি। কর্ম্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর লই সে কর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়—কর্ম্মের সঙ্গে যোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে যদি এই রকম দূরে না যাই তবে কর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য আমরা বুঝতে পারিনে। অবিশ্রাম কর্ম্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্ম্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম্ম তখন মাকড়ষার জালের মত আমাদের চারদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকেনা। এই জন্য অভ্যস্ত কর্ম্মকে পুনর্ব্বার

নূতন করে দেখবার সুযোগ লাভ করব বলেই এক একবার কর্ম্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়।

আমরা কেবলই কর্ম্মকেই দেখবনা। কর্ত্তাকেও দেখতে হবে। কেবল আগুনের প্রখর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার কারখানার মুটেমজুরের মতই সর্ব্বাঙ্গে কালিঝুল মেখে দিন কাটিয়ে দেবনা; একবার দিনান্তে স্নান করে কাপড় ছেড়ে কারখানার মনিবকে যদি দেখে আসতে পারি তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় করে কলের একাধিপত্যের হাত এড়াতে পারি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ জন্মে। নতুবা কেবলি কলের চাকা চালাতে চালাতে আমরাও কলেরই সামিল হয়ে উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছি। এবার কি আবার

নূতন দৃষ্টিতে কর্ম্মকে দেখছিনা ? এই কর্ম্মের মর্ম্মগত সত্যটী অভ্যাস বশত আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাকে পুনরায় উজ্জ্বল করে দেখে কি আনন্দ বোধ হচ্চেনা ?

এ আনন্দ কিসের জন্যে ? এ কি সফলতার মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ দেখে ? এ কি এই মনে করে যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলুম তা করে তুলেছি ? এ কি আমাদের আত্মকীর্ত্তির গর্ব্বানুভবের আনন্দ ?

তা নয়। কর্ম্মকেই চরম মনে করে তাহার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষ কর্ম্মকে নিয়ে আত্মশক্তির গর্ব্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্ম্মের ভিতরকার সত্যকে যখন আমরা দেখি তখন কর্ম্মের চেয়ে বহুগুণে বড় জিনিষটিকে দেখি। তখন যেমন আমাদের অহঙ্কার দূর হয়ে যায়, সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে পড়ে তেমনি আর একদিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তখন আমাদের

আনন্দময় প্রভুকে দেখতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আস্ফালনকে দেখিনা।

এখানকার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল মাত্র? কেবল নিয়ম রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, অঙ্ক কষানো, খেটে মরা এবং খাটিয়ে মারা? কেবল মস্ত একটা ইস্কুল তৈরি করে মনে করা খুব একটা ফল পেলুম? তা নয়।

এই চেষ্টাকে বড় করে দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড় ফল বলে গর্ব্ব করা সে নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল অনুষ্ঠানে মঙ্গল ফল লাভ হয় সন্দেহ নেই কিন্তু সে গৌণ ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গল কর্ম্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে দেখি তবে মঙ্গল কর্ম্মের উপরে সেই বিশ্ব-

মঙ্গলকে দেখতে পাই। মঙ্গল অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাই। মঙ্গল কর্ম্ম সেই বিশ্ব-কর্ম্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁকে দেখতে পায় না—নিরুদ্যম যে, তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন। এই জন্যই কর্ম্ম—নইলে কর্ম্মের মধ্যেই কর্ম্মের গৌরব থাকতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম্ম সেই কল্যাণময় বিশ্বকর্ম্মাকেই লাভ করবার একটি সাধনা তা হলে কর্ম্মের মধ্যে যা কিছু বিঘ্ন অভাব প্রতিকূলতা আছে তা আমাদের হতাশ করতে পারে না। কারণ, বিঘ্নকে অতিক্রম করাই যে আমাদের সাধনার অঙ্গ। বিঘ্ন না থাকলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতিকূলতাকে দেখলে কর্ম্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি নে—কারণ, কর্ম্মফলের চেয়ে আরো যে বড় ফল আছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম

করলে আমরা কৃতকার্য্য হব বলে কোমর বাঁধলে চলবে না—বস্তুত কৃতকার্য্য হব কি না তা জানি নে—কিন্তু প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়—তাতে আমাদের তেজ ভস্ম-মুক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তাঁর প্রকাশ উন্মুক্ত হতে থাকে। আনন্দিত হও, যে, কর্ম্মে বাধা আছে—আনন্দিত হও, যে, কর্ম্ম করতে গেলেই তোমাকে নানাদিক থেকে নানা আঘাত সইতে হবে এবং তুমি যেমনটি কল্পনা করছ বারম্বার তার পরাভব ঘটবে, আনন্দিত হও যে, লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে ও অপমানিত করবে—আনন্দিত হও, যে, তুমি যে বেতনটি পাবে বলে লোভ করে বসেছিলে বারম্বার তা হতে বঞ্চিত হবে। কারণ, সেই ত সাধনা। যে ব্যক্তি আগুন জ্বালতে চায়, সে ব্যক্তির

কাঠ পুড়ছে বলে দুঃখ করলে চলবে কেন? যে কৃপণ শুধু শুষ্ক কাঠই স্তূপাকার করে তুলতে চায় তার কথা ছেড়ে দাও! তাই ছুটির পরে কর্ম্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতার মধ্যে আজ আনন্দের সঙ্গে প্রবেশ করছি। কাকে দেখে? যিনি কর্ম্মের উপরে বসে আছেন তাঁর দিকেই চেয়ে।

তাঁর দিকে চাইলে কর্ম্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলে যায়। চেষ্টার চেষ্টারূপ আর দেখতে পাই নে, তার শান্তিমূর্ত্তিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলতে থাকে অথচ স্তব্ধতা আসে—ভরা জোয়ারের জলের মত সমস্ত থম্‌থম্ করতে থাকে। ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি ঘোষণা রটনা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচে যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্ম্মে বাড়াবাড়ি কিছু-মাত্র থাকে না। শক্তি তখন আপনাকে আপনি আড়াল করে দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে—যেমন সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যাকাশের

নক্ষত্রমণ্ডলী! তার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল গতি, তার ভয়ঙ্কর উদ্যম কি পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করে কি কমনীয় হাসিই হাসছে! আমরাও আমাদের কর্ম্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাসুন্দর রূপ দেখে উদ্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করব—কর্ম্মের উদগ্র আক্ষেপকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে আচ্ছন্ন করে দেব—আমাদের কর্ম্ম, মধু দ্যৌঃ, মধু নক্তম্, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—এই সমস্তের সঙ্গে মিলে মধুময় হয়ে উঠবে।

বর্ত্তমান যুগ

আমি পূর্ব্বেই একটি কথা তোমাদিগকে বলেছি—তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড় কাল, এর অভ্যন্তরে কি প্রচ্ছন্ন আছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব অল্পই এসেছে। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী জুড়ে এক উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। বিশ্ব-মানব প্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে—সবাই আজ জাগ্রত। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জন্য সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করবার জন্য মানব মাত্রেই উঠে পড়ে লেগেছে—নূতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলবে। বসন্ত

এলে বৃক্ষ যেমন করে তার দেহ হতে শুষ্ক পত্র ঝেড়ে ফেলে, নব পল্লবে সেজে ওঠে, মানবপ্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করে সেজে ওঠবার জন্য ব্যাকুল। মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছে, একে এখন কোনমতেই বাইরের শক্তির দ্বারা চেপে ছোট করে রাখা চলবে না।

আসল জিনিষটা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন কি তার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অস্বীকার করে বসি। আজ আমরা বাহির হতে দেখচি চারিদিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাকে আমরা পলিটিক্স (Politics) বলি। তাকে যত বড় করেই দেখি না কেন, সে নিতান্তই বাহিরের জিনিষ। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করচে সত্য হয়, তবে তা ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধর্ম্মের মূল-শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে

কাজ করচে বলেই আমাদের চোখে ধরা পড়চে না ; পলিটিক্‌সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখে থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না। কিন্তু বস্তুত ভগবান যে মানবসমাজকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে একটা মস্ত নাড়া দিয়েছেন, এইত বিংশ শতাব্দীর বার্ত্তা। বিশ্বাস কর, অনুভব কর, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়ে আজ এই ধর্ম্মের বৈদ্যুতশক্তি ছুটে চলেছে। পৃথিবীতে আজ যে-কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসবে না। আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকবার দিন ? তন্দ্রা কি ছুটবে না ? আকাশ হতে যখন বর্ষণ হয়, ছোট বড় যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মঙ্গলের আধার

পূর্ব্ব হতে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানেই তাহা কল্যাণে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। সার্থকতা আজ সহজ হয়ে এসেছে; এমন সুযোগকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। তোমরা আশ্রমবাসী এই শুভযোগে আশ্রমকে সার্থক করে তোল। প্রস্তরের উপর দিয়ে জলস্রোত যেমন করে বহে যায়, সেখানে দাঁড়াবার কোনই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়ে তেমনি করে এই প্রবাহ যেন বহে না যায়! ঈশ্বরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত হবার সময় এখানে এসে একবারটি যেন পাক খেয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি কেন, পৃথিবীর যেখানে যে-কোন ছোট বড় সাধনার ক্ষেত্র আছে মঙ্গল-বারিতে আজ পূর্ণ হোক। আশ্রমে বাস করে এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হতে

দিও না। এখানে কি শুধু তুচ্ছ কথায় মেতে হিংসা দ্বেষের মধ্যে থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লয়ে দিন কাটাতে এসেছ? শুধু পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করে ফুটবল খেলে এতবড় একটা জীবনকে নিঃশেষ করে দেবে? কখনই না—এ হতেই পারে না। এই যুগের ধর্ম্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তপস্যার দ্বারা সুন্দর হয়ে তোমরা ফুটে ওঠ। আশ্রম-বাস তোমাদের সার্থক হোক। তোমরা যদি মনুষ্যত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করে ধরে না রাখ, শুধু খেলা ধূলা পড়া শুনার ভিতর দিয়েই যদি জীবনকে চালিয়ে দাও, তবে যে তোমাদের অপরাধ হবে, তার আর মার্জ্জনা নেই, কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে এসেছ, ভাল করে সেই কালের বিষয় ভেবে দেখ। বর্ত্তমান কালের একটি সুবিধা এই—বিশ্বের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠেছে

একই সময়ে সকল দেশের লোক তাহা অনুভব করছে। পূর্ব্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠলে অন্য স্থানের লোকেরা তার কোনই খবর পেত না। প্রত্যেক দেশটি স্বতন্ত্র ছিল। এক দেশের খবর অন্য দেশে গিয়া পৌঁছবার উপায় ছিল না। এখন আর সে দিন নেই। দেশের কোন স্থানে ঘা লেগে তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ শুধু দেশের মধ্যে না—সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তীরের মত ছুটে চলে। আমরা সকলে এক হয়ে দাঁড়াই। কত দিক হতে আমরা বল পাই; সত্যকে আঁকড়ে ধরবার যে মহা নির্য্যাতন তাকে অনায়াসেই সহ্য করতে পারি; নানাদিক হতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদনা এসে জোর দেয়—এ কি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলে মনে করি না। এই তো মহা সুযোগ। এমন দিনে আশ্রম বাসের সুযোগকে হারিও না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—

ক্ষতি তোমাদেরই। গাছ ভরে বউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত ঝরে পড়ে, শুকিয়ে যায়, তবু ফলের অভাব হয় না। ডাল ভরে ফল ফলে ওঠে। ফল হল না বলে গাছ দুঃখ করে না, দুঃখ ঝরা-বউলের, তারা যে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে পারল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হতেছিল, বৃক্ষগুলি যখন ধীরে ধীরে আলোর দিকে মাথা তুলে ধরছিল, তখনও এই নূতন যুগের কোনই সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌছায় নি। অজ্ঞাতসারেই আশ্রমের ঋষি এই যুগের জন্য আশ্রমের রচনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তখনও বিশ্ব মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নি, শঙ্খ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দীর জন্য বিশ্ব-দেবতা গোপনে গোপনে কি যে এক বিপুল আয়োজন করছিলেন, তাহার লেশমাত্রও আমরা জানতুম না। আজ সহসা

মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হল—আমাদের কি পরম সৌভাগ্য। আজ বিশ্ব দেবতাকে দর্শন করতেই হবে, অন্ধ হয়ে ফিরে গেলে কিছুতেই চলবে না। আজ প্রকাণ্ড উৎসব; এই উৎসব একদিনের নয়, দু দিনের নয়—শতাব্দী-ব্যাপী-উৎসব। এই উৎসব কোন বিশেষ স্থানের নয় কোন বিশেষ জাতির নয়—এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগৎ-জোড়া উৎসব। এস, আমরা সকলে একত্র হই, বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোন রাজার যখন আগমন হয় তাঁকে দেখবার জন্য যখন পথে বাহির হয়ে আসি তখন মলিন জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তখন নবীন বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের রাজা নন সমগ্র জগতের রাজা এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন, নত কর উদ্ধত মস্তক। দূর কর সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জ্জনা। মনকে শুভ্র করে তোল। শান্ত হও, পবিত্র হও।

তাঁর চরণে প্রণাম করে গৃহে ফের। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিন— মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।

—